গল্প

মার্গারেট

রাবেয়া খাতুন

বেলা দশটার পর পাড়া একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়। পথঘাট, বাড়িঘর কোথাও কেউ নেই। রূপকথার সেই মানুষহীন রাজ্যের কথা মনে হয়। রাক্ষসের ভয়ে রাজ্যের লোক হয় পালিয়েছে, নয় পাথর হয়ে গেছে আতঙ্কে।

আইজ্যাক রোডের দোতলা এই বাড়ি থেকে যদ্দুর চোখ যায় ধু ধু উপত্যকা। তার ওপারে এখানকার প্রধান পর্বত মাউন্ট কোজিয়াস্কর বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা। পাথরে পাথরময়। ওরাই যেন রূপকথার সেই মানুষ। একবেলা চোখ রেখে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দেখা যায় পাহাড়তলীয় ছায়া-প্রচ্ছায়ার রহস্যময় আলোর খেলাধুলা, কখনো রোদ, কখনো কুয়াশা, ছোট ছোট নানাবর্ণের পাখির ওড়াউড়ি। দূর আকাশসীমায় মেঘকন্যাদের আনাগোনা।

বেলা একটু বাড়লেই উপত্যকার বাড়িঘর একটু যেন নড়ে চড়ে ওঠে। সাই করে স্কুল বাস ক্ষণিকের জন্য পথ কাঁপিয়ে যায়। একজন-দুজন করে সকালের ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফিরতে থাকে। কেউ জুটি ধরে সাইকেলে। আবার পায়ের কাছে বল নিয়েও ছুটে দু-চারজন। চিপস আর চকোলেট মুখে করেও কেউ।

তারপর ডাক পিয়নদের দেখা পাওয়া যায়। লেটার বক্সে চিঠি ফেলে মোটরসাইকেল চালিয়ে তখনি ভোঁ। সাপ্তাহিক বিন্ পরিষ্কারওয়ালা গাড়ি এসে দাঁড়ায় গেরস্থের বাইরের আঙ্গিনায়। কোনো বাড়ির সাময়িক মালির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে দু-চারটা ধরাবাধা কথা– হ্যারি দুদিন তোমায় দেখিনি। মৌসুমের হাল এবার মনে হচ্ছে আগে আগেই ঠাণ্ডাটা পড়বে।

হ্যারি গাছের পাথুরে মাটি হাতের যন্ত্রে আলগা করে দিতে দিতে জবাব

দেয়, মে মাস পড়ে শীত তো জাঁকিয়ে আসবেই।

বুকের জমানো কফ সম্পর্কে সাবধান থেকো।

আর কত সাবধানে থাকবো? বয়স হলো প্রায় আশি।

তোমায় দেখলে এখনো ইয়াং লাগে। মদটা ছেড়েছ?

দেখো ডাক্তারের সব কথা মানলে চলে না। এই যে জুন-জুলাই মাসে রক্ত হিম করা উইন্টার আসবে তখন ওটা ছাড়া কে আমায় শক্তি যোগাবে? তুমি কেমন আছ? চ্যাংড়া মানুষ ভালোই থাকবে।

যত ভালো ভাব তা নয়। বৌ নটখটি করছে বাচ্চা হবার পর থেকে। আমার এই নোংরা জবটি আর তার বরদাস্ত হচ্ছে না।

মাঝে তৃতীয় কেউ ঢোকেনি তো?

এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। ম্যাগকে অবিশ্যি সন্দেহ হয়। কিন্তু সে ছোকরার তো যথেষ্ট সুন্দরী বৌ রয়েছে।

আর কি করবে? আগে থেকে গাঁটের পয়সা গোন। বিয়েতে যা খর্চা হয়ে গেছে, ডিভোর্সে যাবে দ্বিগুণ।

হ্যারির কথার শেষে বীন থেকে ময়লা তুলছিল যে ছেলেটি সে একটু টোকা দিল। ড্রাইভিং সিটে বসে কথা বলছিল টম। সে স্টার্ট নিয়ে বললো, চলি। আবার দেখা হবে। আমার জন্য প্রভু যিশুর কাছে একটু প্রার্থনা করো। বৌ যেন ছেড়ে না যায়।

হ্যারি বিদগ্ধ হেসে একা এক মন্তব্য করলো, আমার প্রার্থনায় কি যাবে আসবে? যা হবার তা হবেই। তুমি আমি থোড়াই থামাতে পারব-হা-হা-হা।

গাড়ির শব্দ চলে যেতে আবার হা হা খা খা করা রাজপথ। মোড়ে এ সময় দাঁড়াল একটি বাস। স্টপেজে এটা দাঁড়ায় একটু বেশিক্ষণ। এ গাড়ির অধিকাংশ যাত্রীই আশি-নব্বুই বছরের। এই দুপুরে অপেক্ষাকৃত ভাড়াও কম এদের জন্য।

আমি এ সময় দোতলা থেকে নেমে আসি। বাইরের বাগানের বেগুনি কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় দাঁড়াই। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এ স্টপেজে দুজন বৃদ্ধ নামেন। দুজন বুড়োবুড়ি কথা বলতে বলতে এক বাড়ির বোগনভোলিয়ার অন্তরালে-আড়াল হয়ে যান। দুজন বৃদ্ধ আর একদিকে। আর একজন উল আর কাঁটা হাতে। ইনি সারা বছর বাইরে বেরোন ঐ সুতো কাঁটা বুনতে বুনতে। একজন আমাদের বাড়ির ফুটপাত দিয়ে কোথায় যায় কে জানে। আজও লাঠি নির্ভর হয়ে পাশ কাটাচ্ছিলো। এরা এ সময় বাজার করে ফেরে। হঠাৎ হাত ফসকে একটা ব্যাগ থেকে তরি-তরকারি যাবতীয় পাড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। বিপন্ন মুখে মহিলা সেগুলো তুলতে গিয়ে তাকালো চারদিকে। চোখাচোখি হলো কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমিও এগুলাম না। তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। গড়ে গেলে হাত বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে দেখেছি, ভীষণ রুষ্ট

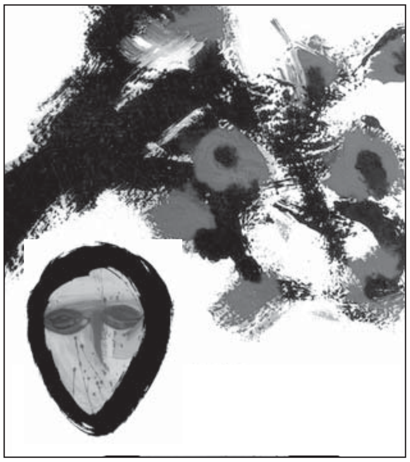

চোখে তাকায়। কেউ বা বলেই ফেলে, এখনো এতো বুড়ো হয়ে যাইনি যে তুলতে এসেছ।

পেছন থেকে আর একজন হয়তো বলে, যারটা তাকেই সামলাতে দাও। তুমি বৃথাই মাথা ঘামাচ্ছ। কয়েক মিনিট ইনির হয়রানি দেখে এগিয়ে না গিয়ে পারলাম না। না হয় একটু কথা শুনবো। বললাম, আমি কি তোমায় একটু সাহায্য করতে পারি?

বৃদ্ধা মুখ তুলে তাকায়– পার।

মাঝারি কয়েকটা শুকনো খাবারের টিন, আলু, ছোট চেরি, বিন, কিছু শাকসবজি। একটি একটি করে কুড়িয়ে ব্যাগজাত করে দিলাম। মেনি মেনি থ্যাংকস দিয়ে মহিলা গুটি গুটি পায়ে আবার চলতে শুরু করলেন।

পরে পরে আলাপ হলো। নাম মার্গারেট। সবাই ম্যাগি ডাকে। বয়স পঁচাশি ছুঁই ছুঁই। সত্তরে চতুর্থ স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে। তিন স্বামীর ঘরে দুছেলে এক মেয়ে। ছেলেরা একজন থাকে সিডনি। অন্যজন মেলবোর্ন। ছেলেরা বছরে একবার ক্রিসমাসের কার্ড পাঠায়। মেয়ে দু-তিন বছর পর একবার আসে। ক্রিসমাসে সেই যায় নাতি-নাতনীর জন্য কেক তৈরি করে নিয়ে গোল্ড কোস্টে।

চোখ ঈষৎ বুজে বলে, জান সেই এক শীতে আমার তো হাঁপানির মতো হলো। জুলাইতে এমন শীত পড়ে পুরো ঘর হিটিং করেও কাঁপি শেষ রাতে। নেহাত অফিস-টফিস বা জরুরি কিছু না হলে পথেঘাটে লোক পাবে না। এমন ভয়ঙ্কর সময়ে মেয়ে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে জেনে তড়িঘড়ি চলে এল। নিজের সংসার ফেলে সন্তান ফেলে টানা সাতদিন থাকলো আমার সেবায়। ওর বস্ বিনা নোটিশে চলে এসেছিলো বলে মুখ খারাপ করেছিল। আমার মেয়ে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নতুন অফিসে জয়েন করেছিল। ভাবতে পার আমার জন্য কেমন দরদ! মা মেরীকে নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। ওহ্-

বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে তখনি বললো, ঐ দেখ আমি যে মার কাছে মামা বাড়ির গল্প করছি। তোমার দেশে তো এগুলো অতি সাধারণ ব্যাপার আমি জানি। ঠিক না?

হেসে মাথা নাড়ি। ম্যাগী জিজ্ঞেস করে, তোমাদের এসব ব্যাপারগুলো আমার খুব ভালো লাগে। পুবের গোল থেকেই একদা পশ্চিম ধার নিয়েছে অনেক কিছু। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি। আবার তাদের ধার নেবার সময় এসেছে। তোমরা বুড়োদের নাকি এখনো সম্মানের চোখে দেখ। পরিবারের মধ্যে রাখ। দরকার হলে পরামর্শও নাও। যা আমরা ভাবতে পারি না। ব্যক্তিস্বার্থ আর শরীরসর্বস্ব জীবনই যেন ধ্রুবতারার মতো সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে। ওল্ডহোম তো আছেই। আরও আরও নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটছে।

একটু থেমে আবার বলে, বলতেও লজ্জাবোধ করছি। আমাদের এই ভ্যালির সব শেষ কটেজে বাস করতো সে বুড়ো। তার পেনশনের টাকাটাও নিজের কাছে রাখতো না। এমন নির্ভরশীল ছিল ছেলের সংসারে। জনসনের যেন কি এক অসুখ হলো। বেরুত মাঝে মাঝে। একদিন দেখলাম সামারে ছেলে আর নাতির সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে। প্রায়ই যায়। হবে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে। কিন্তু সেবার ফিরে আর এলো না। নাক গলাতেও আমরা কেউ যাইনি। তিনদিন পর একটা পিকনিক পার্টির ইয়াং ছেলেরা মরণাপন্ন হালে তাদের গাড়িতে করে জনসনের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

বললাম, কি হয়েছিল? হারান-টারান–

কথার মাঝে কথা বললো ম্যাগী। বড়ই বিষণ্ন তার কণ্ঠস্বর- ওসব নয়, ওসব নয়। তুমি ধারণা করতে পারবে না নিষ্ঠুরতার নমুনা। পরে জনসন আমায় বলেছিল এক ক্যান পানি, এক পাউন্ড রুটি আর মাখন দিয়ে ওর ছেলে বলেছিল বাবা তুমি বিশ্রাম কর আমরা একটু বনটা ঘুরে আসি। জনসন সবই বুঝতে পারছিল কিন্তু বলতে পারেনি কিছু, কারণ বয়সকালে সেও তার বুড়ো বাপকে এমনি করে জঙ্গলে ফেলে এসেছিল।

ফিরে আসার পর জনসনের কি হলো?

কি আর হবে। ছেলের বৌর খোঁটা, ছেলের বিরক্তি সহ্য করে পোকা-মাকড়ের মতো জীবন। আমায় বলেছে যেকোনো সময় আত্মহত্যা করবে। আমি মানা করেছি। বুঝলে ক্যানো মানা করেছি? ও বলে কিসের পাপ? অপমান গিলে গিলে স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তাকিয়ে থাকবো? ঈশ্বরের ভুল হয়। ষাটের পর পরমায়ু দিয়ে মানুষকে তিনি শুধু হেনস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। কিসের জন্য এরপর বেঁচে থাকা বল? যৌবনের যত আনন্দ লুটেপুটে খাওয়া হয়ে গেছে। এখন দুর্বল দেহটা শুধু নানা অসুবিধায় ফেলছে। নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে খাবার ইচ্ছা ভীষণ বেড়ে গেছে। এতো খাবার আমায় কে দেবে? গেস্ট রুমে থাকি। খোঁজ খবর বলতে নাতিটাই যা একটু নেয়।

মেয়ে নেই ভদ্রলোকের?

নেই আবার? আমরা অস্ট্রেলিয়ানরা

সাধারণত তিনটি বাচ্চা নেই। ওর তো সবকটাই মেয়ে। তো বলিহারি বাবা মেয়েগুলো। একটাও যদি ফিরে তাকায়? কবে বারো বছর আগে ছোট মেয়েটা এসেছিল। একটা হাতঘড়ি প্রেজেন্ট করে গেছে। সেটা যেনো সত্য ঘটনা নয়, স্বপ্ন। এমনভাবে গল্প করে জনসন।

তোমার বন্ধুর জন্য তোমারও তো দায়িত্ব রয়েছে নাকি?

ফিল তো করি, কিন্তু কাজে কি আসতে পারি? আর এমন বন্ধু তো আরও আছে। আমার নিজেরই যা অবস্থা কাকে ফেলে কাকে দেখবো? ওরাও পারে না। আমিও পারি না।

হঠাৎ যেন চোখে-মুখে অপার্থিব আলো ঝলকালো ম্যাগীর ঝুলে পড়া সর্ব শরীরে। বললো, আনন্দের কথা তোমায় তো বলেছি। বলিনি? ভারতে হায়দ্রাবাদ বলে একটা সিটি আছে না! যেখানে হীরের খনি আছে। আমার লাস্ট বয়ফ্রেন্ড সেই ছিল। আমার বয়েস তখন সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু তখনো যথেষ্ট সুস্থ, যথেষ্ট সুন্দরী। আনন্দের তখন ত্রিশ চলছে। দুবছরের ট্রেনিংয়ে এসেছিল। একটা দিনও আমরা ব্যর্থ হতে দেইনি। গোটা জীবনে যতজনের সঙ্গে প্রেম হয়েছে ওই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। আমরা প্রায়ই প্রশান্ত মহাসাগর কিংবা কোজিয়াস্ক পাহাড়ের শাখাগুলো জ্যোৎস্না রাতে বা প্রচণ্ড শীতে কাটাতাম। সেই রাত জায়গায় পরে আমার শেষ স্বামীর সঙ্গে গেছি। অমন স্বাদ পাইনি আর। জর্জও বাঁচেনি এক বছরের বেশি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর আবার ঠোঁট খুললো, বার্ধক্য ঈশ্বরের দান নয়, প্রকৃতির নিয়ম। সূর্যের আলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক। সূর্য ক্ষয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমরাও। আমিও হয়তো কোনদিন দেখবো একা ঘরে মরে শক্ত হয়ে আছি।

বলেই 'ফিক' শব্দ করে নকল দাঁতে হেসে ফেলল। বললো, বুড়ো হলে এমনই হিসাব ছাড়া কথা বের হয়। তুমি দেখবে কি বড়জোর শুনবে। তুমি তো এসেছ বেড়াতে।

মাথা নাড়ি। প্রসঙ্গ কোন দিকে যেন নিয়ে যায়- কদ্দিন এসেছ তুমি তোমার ছেলের কাছে?

হবে মাস দুই। রিটার্ন টিকেট কাটা ছিল। কিন্তু ও সেটা বদলে এনেছে। শীতের আগে যেতে দেবে না কিছুতেই।

আমি শুনেছি তোমাদের ছেলেরা এমনি হয়। ঘরে বৌ আছে বলছ। তার মধ্যেও এমন ভালো কেমন করে থাকে। তোমরা ভাগ্যবান দেশে জন্মেছ। আর একটা জন্ম তো আমাদের নেই। থাকলে ঈশ্বরকে বলতাম, তোমাদের দেশেই যেন জন্মি।

উঠে পড়ল। লাঞ্চের সময় পার হচ্ছে। ম্যাগীর প্রচন্ড খিদে পেয়েছে। মাখন, রুটি মজুদ আছে। একটু সেঁকে নিতে হবে। রাজ্যের আলস্য। মাইক্রোওয়েভের দিকে যেতে যেতে একটু খুশি খুশি চোখে তাকাল। রুটি খেতেও আজকাল কষ্ট হয়। আজ সে মাসিক ভাতা তুলেছে। কাল নরম খাবার এবং দামি ফল কিনে আনবে। সবচেয়ে মূল্যবান ফলের মধ্যে আম। দশ ডলার কেজি। খেতেও সুস্বাদু। ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, তোমাকেও খাওয়াব।

কিছু মনে করো না। তোমাদের এখানকার চেয়ে আমাদের আম স্বাদে গন্ধে অনেক ভালো। আম এমনিতেই আমার প্রিয় ফল নয়।

আলুবোখারার যে আচারটা আমায় উপহার দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানান হয়নি। আজ রুটির সঙ্গে মজা করে খাব।

তুমি খাও। আমি উঠি।

ঐ যা! ভিমরতি আর কাকে বলে? তোমার ছেলে না গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ। একজন ইয়াং ছেলে কি করে পারে এমন। তাও ছুটির উইক অ্যান্ডে।

যাই। পুরো পরিবার অপেক্ষা করে আছে। ও বেলা আছে লেকে মাছ ধরা।

আছ মজায়।

ওর কথা পেছনে রেখে প্রবালের ল্যান্ডরোভারে। ক্যানবেরা শহরটা বেশ ছোট। প্ল্যান ওয়েতে গড়া রাজধানী। এখানকার প্রধান শহরগুলো সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে। এ টাউন সমুদ্র থেকে অনেক দূরে। কিন্তু চারদিক ঘেরা কৃত্রিম বড় বড় খালে। পানির কমতি নেই। তবু সরকারি প্ল্যানে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা হয়। মেলবোর্নে বড় বড় দীঘি আছে পানি সংরক্ষণের জন্য। যদি কখনো প্রয়োজন হয়।

ক্যানবেরার নকল খালে বাঙালি পরিবার প্রায়ই মৎস্য শিকারে আসে। বেড়ানোতেও। খালের ধারটা পাকা। চমৎকার বাগান। দেশী-বিদেশীদের জগিংয়ের ভালো জায়গা। তাছাড়া সিনিক বিউটি তো আছেই। কেউ কেউ বোটিংয়েও অংশ নেয়। বাঙালি প্রবাসীরা যে বেশি মাছ ধরতে পারে, প্রতিবেশীদের তাজা অথবা রান্না করে পাঠায়। স্থানীয়রা অধিকাংশই কাঁটাযুক্ত মাছ ধরা পড়লেই 'ডার্লিং ফিরে যাও' বলে খুব করে চুমু খেয়ে ছুঁড়ে দেয় ক্যানেলের স্রোতে।

সেদিন ডিনারের পর আবার ক্যানেলের দিকে যাব চন্দ্ররাত উপভোগ করতে। প্রবালের স্থানীয় প্রতিবেশী চিৎকার করে ডাকলো, মি. রেজা বেরিয়ে আসুন তো।

সে ডাকে বেরিয়ে এলো উল্টোদিকের প্যালেস্টাইনি পড়শি ইয়াকুব জামসেজ। শ্রীলংকার পলগোলা। সবাই হৈ চৈ করে ছুটে গেল রাস্তার এদিক-ওদিকে। ইয়াং জেনারেশনের কিছু ছেলের মাথা খারাপ হয়ে যায় এইসব চাঁদনী রাতে। সমানে পাথর ছুঁড়ে লাইটপোস্টের বাল্ব ভাঙে। এরা ছুটে গেলে ওরা পিঠটান দিয়ে পালায়। পুলিশের গাড়ি আসে।

ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়ে যায় এই ব্যাপারে।

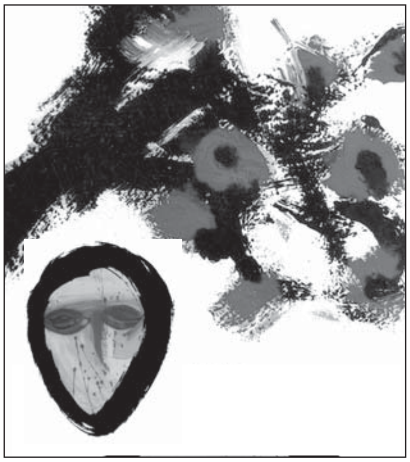

সে রাতে আর বের হলাম না। স্কুল-কলেজ, অফিস। দুপুরটা ফাঁকা ফাঁকা। টেবিলে বসি। পিয়ন দেখি, মালি। সকাল সকাল ফিরে আসা ছেলেমেয়ে। এবং পাইন পপলারের পাতাঝরা। গাড়ির পিছু পিছু তো শুকনো পাতা ছোটে না, সোনার পাতা যেন ছোটে।

হঠাৎ খেয়াল হলো ম্যাগীর দেখা নেই দিন সাতেক। বাজার শেষ করে ওকে এ পথেই তো উপত্যকার বাসায় ফিরে যেতে হবে। মরে পড়ে নেই তো আবার! প্রতিবেশীরা অবিশ্যি কারো লেটার বক্সে চিঠি জমতে টটস্থ হয়। শুনেছি ওদের পাড়ায় এক বুড়ো আছে, শেষ জীবনে সে বেছে নিয়েছে পরোপকারের কাজ। চিঠির খোঁজ-খবর করে দুটি কারণে। এক. সব বুড়োবুড়িই একা থাকে। গত রাতে কেউ শেষ নিঃশ্বাস ফেলল কি না। আবার ঐ জমা চিঠির সূত্র ধরে নেশাসক্ত দুষ্টু ছেলেরা দিনের বেলা চুরি করতে আসে।

কয়েকটা উঁচু-নিচু বাঁক, একটা বড় বুনোচেরি গাছ, ফাঁকা জমি খানিকটা। সবুজ ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে গগলস্ চোখে শুয়ে একজন মধ্যবয়সী। রাস্তার একপাশে সরানো বিকল গাড়ি। মোবাইলে রিং পাঠাচ্ছে নষ্ট ইঞ্জিন সারাই করা লোকদের। একটু দূরের পারপল রঙ ছোট পাহাড়ি এলাকায় রাজ্যের কাকাতুয়া। খানিকটা না দাঁড়িয়ে পারি না। অবারিত প্রকৃতি। সাদা কাকাতুয়াগুলো যেন নড়াচড়ার ভেতরও তার অংশ হয়ে আছে।

কোকাতে কোকাতে দুয়ার খুললো ম্যাগী। জ্বরে কি গা পুড়ে যাচ্ছে? তা নয়, তা নয়। ম্যাগী বললো, ঈশ্বর ওদের গায়ের বর্বর শক্তি কেড়ে নেবে। দাবানলের আগুনে আধপোড়া হবে। ওহ্ জোয়ানীর দম্ভ। ভাঙবে ভাঙবে ভাঙবে...

না ম্যাগীর নরম খাবার এবং আম কেনার সৌভাগ্য হয়নি। নেশার ট্যাবলেট খাওয়া তরুণদের এ অত্যাচার সরকারও থামাতে পারছে না। ওরা এক এক পাড়ায় আসে এক এক সময়। দুজন কি তিন জন। যেখানে বুড়োবুড়িদের বাস। জোর করে ঢোকে। জোর করে হাত-পা বাঁধে। পেনশনের টাকাকড়ি

দিতে গড়িমসি করলে মারও লাগায়। সেদিন ওরাই এসেছিল। ভাগ্যিস মরিয়মের ঘরে ঢোকেনি। সেই ধার দিয়ে বাঁচিয়েছে ম্যাগীকে। মেয়েকে চিঠি লিখেছে। এ মাসের বাকি খর্চাটা যেন সে পাঠায়।

গর্বিত মুখে বললো, মেয়েটা আমার বড্ড ভালো। তবে চাকরিটা তেমন সুবিধের নয় বলে ঠিকমতো তত্ত্ব তালাশ করতে পারে না। নইলে কি আমার এ অবস্থা থাকতো!

ঝাঁপি থেকে কিছু উল বের করলো। মেয়ের বাচ্চাদের জন্য মোজা বুনছে। বললো, এক বছর আগেও পুলওভার বুনতে পারতাম। এখন পারি না। ঘর গুনতে গেলে মাথায় লাগে। বৃদ্ধ বয়সটাই এমন। জান, প্রতিদিনই কিছু না কিছু ক্ষয় হয়। এতো দ্রুত আর কোনও বয়সেই হয় না।

চুপ করে থাকি। আমি ক'মাসই বা এসেছি। ও আরও যেন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছে। পরিহাস তরল স্বরে কখনো বলে, জনসন বলছিল ঈশ্বর আমাদের মতোই বুড়ো, তাই কোনও প্রার্থনাই তার কানে যায় না। নয়তো বুকটা তার পাথরের। আমি বলেছি, মোটেও সে বুড়ো নয়। একদম টাটকা সবুজ যুবক। না হলে তরুণদের প্রতি এতো প্রসন্নতা।

এখানকার দুধে ভেজাল নেই। চিনিতেও। প্রায়ই পুডিং করি। এক বাটি নিয়ে গেলাম একদিন। ঐ সামান্যতে কী খুশি, কী খুশি। গালে গাল লাগিয়ে বললো, কদ্দিন খাইনে। দোকানে রাজ্যের দাম। নিজের করার ক্ষমতা নেই। এক্ষুণি যদি খেতে শুরু করি তুমি কিছু মনে করবে?

খেতে খেতে বললো, তোমরা এশিয়ানরা বড় ভালো। পশ্চিমাদের মতো তিল থেকে তালের হিসাব-নিকাশ কর না। আমাদের মতো বিনিময় নিয়মে যান্ত্রিক নও।

ক্রিসমাসের অনেক আগে থেকেই এখানে প্রস্তুতি চলে। নগর সজ্জা। বাসাবাড়ির একটু ভিন্ন রূপ। নববর্ষে কার্ডের দোকানগুলোতেই যেন সবচেয়ে বেশি ভিড়।

ম্যাগী খুশি খুশি গলায় জানাল। এবার সে কার্ডের দোকান মাড়াবে না। মেয়ের জন্য কেকও তৈরি করবে না। না- না তুমি মনে কর না কোনও বয়ফ্রেন্ড জুটেছে। তার সঙ্গে মজা করে কাটাব। ইচ্ছেটা থাকলেও ঈশ্বর কি সে অবস্থায় রেখেছে?

যেন কিছু ঘটে গেছে, এমন ছুকরি ছুকরি ফন্দিতে তখনি বললো, এবার আমি ছেলে, বৌ, নাতিদের কাছে কাটাব।

তারা বুঝি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে?

দুর দুর, কোনও দিনই কি সে কাজটি করেছে। ঠিক করেছি নিজেই যাব। বাচ্চাটা আমাকে চায়। বলতে পার গ্রানি বলতে পাগল। ও যা খুশি হবে না!

জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। একটা টকটকে সিল্কের লাল চাদর বের করে তখনি, এটা কাউকে দেখাই না। আমার দ্বিতীয় স্বামীর উপহার। তোমাকে পরে দেখাই।

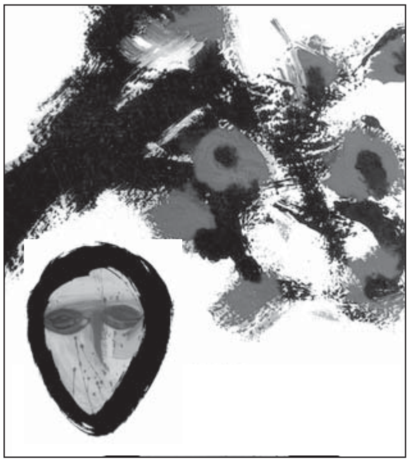

একটু আড়ালে গিয়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে বললো, এখনো আমায় মানিয়েছে না?

একজন বৃদ্ধাকে যে লাল পোশাকে ভালো লাগে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। হাসিখুশিতেও মানুষ আলোকিত হয়। সেই মুহূর্তে মার্গারেটকে চমকদারই লাগছিল। বিশেষ করে নীল দুটি চোখের মণি। আমার দিকে চেয়ে উচ্ছল উজ্জ্বল হলো ম্যাগী। প্রায় নাচার ভঙ্গিতে বললো, বোঝ তাহলে যৌবনে কেমন ছিলাম। যে ছেলের কাছে যাচ্ছি ওর বাবা এটা দিয়েছিল। খুব ভালো স্বামী ছিল। কিন্তু দুই বছরের বেশি সম্পর্ক টেকেনি।

দোষ কী ছিল?

তোমরা তো জান দুই জাতের ইংরেজ এসেছিলো এই মহাদেশে। প্রথম দিকে চোর-ডাকাত। পরের দিকে ভদ্রলোক। আর ছিল সেই দুর্বৃত্তের বংশধর। আমাদের আসল 'হোম' তো লন্ডনে। সেখানে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ল। ব্যস আমারও মুড অফ হয়ে গেল। আমার বংশ পরিচয় আছে। পেছনে দু-চারজন যুবক লেগেই আছে। প্রতারক দোষে ডিভোর্স নিলাম। পরে মনে হয়েছে চার স্বামীর মধ্যে ওই আমাকে বেশি ভালোবাসত। কিন্তু শরীরসর্বস্ব সভ্যতার রূপসী রমণী কি তখন তার মূল্য বুঝতো।

লম্বা শ্বাস নিলো। ব্যাগের তলার গোপন কুঠুরী থেকে অতি সাবধানে বের করে আনলো একটা টুকরো সাদা পাথর। দ্যুতি ছড়াচ্ছে। দেখেই চিনলাম- হীরা। অতি মমতায় গালে লাগিয়ে আবেগতাড়িত ম্যাগী বললো, এটা আমার ভারতীয় প্রেমিকের উপহার। কী কষ্টে ড্যাকরাগুলোর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। ছোঁড়াগুলো চিন্তাই করতে পারবে না আমার কাছে এমন দামি পাথর আছে। এটা ভেবেছি নাতিটাকে এবার দিয়ে আসব। মরে গেলে সে-ই মনে রাখবে।

তারপর নাতি রবার্টের একটা ছবি দেখাল। নিতান্তই বালক। ম্যাগী বললো, তোলপাড় হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয়? খুব চটপটে, খুব জলি।

কবে যাচ্ছ?

চিঠিতে বিশদ লিখেছি। এই তো জবাব এসে গেলেই। দাঁড়াও তোমায় একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

ঘরের গোপন কোণ থেকে বের করে নিয়ে এলো কম্পিউটার। বললো, ক'দিন তোমায় মিস করবো। তাতে কী। আমার খুশিতে তুমি খুশি হবে। ভারতীয়রা নাকি হয়।

হাতে একটা ম্যাপ। সেই সঙ্গে চশমা। আবার বললো, মেলবোর্নের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় হাজার কিলো। সীমান্তের শহর অলবুড়ি। রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার বাসে রওনা। অলবুড়ির একটা হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ভরম্ আছে সিনিয়রদের জন্য। সব বুড়িবুড়ো একসঙ্গে হয়ে গালগপ্পে গরম কফির চুমুকে চোখের পলকে নাকি রাত ভোর হয়ে যায়। রিসেপশনের লোকটা তেমনি ধারণাই দিয়েছে। এখন কম্পিউটারে ঘর দেখ।

সত্যি কম্পিউটারে ভেসে উঠল ডরমিটরি গৃহের চেহারা। গরিব গরিব আসবাবপত্র। প্রায় হতচ্ছাড়া রূপ। ম্যাগী বললো, দশ ডলারে এর চেয়ে ভালো আর কী পাবো?

ম্যাগীকে আঘাত কখনো করি না। ওর খুশিতে সায় দিয়ে যাই। টার্গেটের মধ্যে রাখি। কখনো ওকে নিয়ে লিখবো।

ওর সম্ভাব্য যাত্রার তারিখের আগের দিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে আবার গেলাম। কপালের একদিকে একটু ফোলা। ছ্যাত করে উঠল বুকের ভেতর। কাল রাতে আবার লুটেরারা আসেনি তো? মারধর করে নিয়ে যায়নি তো শেষ সম্বলটুকু?

মার্গারেটের চোখের দৃষ্টি খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু বুঝল। ভাঙা গলায় বললো, এটা হচ্ছে বয়সের আক্কেল সেলামি। সেই হীরাটাকে আবার লুকাতে গিয়ে ড্রয়ারের কোনো লাগল কপালে।

হীরেটা লুকানোর দরকার হলো ক্যান। কাল তো যাচ্ছ।

না যাচ্ছি না। আমার যাওয়া হবে না।

প্রেসার আবার হাই হয়েছে? হার্টের অবস্থা খারাপ? নাকি হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়েছ আবার।

ওসব কিছুই নয়। আমি শারীরিক ভালো আছি। মানসিক ভালো নেই। কী করে থাকবো বল? অত বুঝিয়ে, অত সুন্দর করে চিঠি লিখলাম। তার জবাবে আমার ছেলে কি জানালো? তার আপত্তি কিছু ছিল না। নাতিটারও নয়। কিন্তু বৌ বলেছে আমি গেলে তাদের ক্রিসমাসের পারিবারিক আনন্দ নষ্ট হবে। আমার ছেলেকে ওয়ার্নিং দিয়েছে, আমি গেলে সে বাপের বাড়ি চলে যাবে...

ম্যাগীরা সাধারণত চোখের পানি ঝরায় না। স্বাভাবিক ধরে নেয় সবকিছু। কিন্তু ডায়ালগটা শেষ করতে পারলো না। নীল চোখের মণি ঝকঝক করছে অনিরুদ্ধ অশ্রুকণায়।

অলংকরণ : **ধ্রুব এষ**